প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৬১

প্রকাশক
নারায়ণ সেনগুপ্ত
প্রাইমা পাবলিকেশনস
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭

মুদ্রক
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
মণীন্দ্র মিত্র

সূচী

নামমাত্র রবীন্দ্রনাথ ৯
মায়ের মুখ ১০
দীঘার দর্পণে ১২
শ্রাবণী সারঙ ১৩
একদা হলুদপুকুর ১৪
আসছে বছর ১৬
যেও না বাহিরে ১৮
শরীরী স্বপ্নেরা ১৯
মহাভারতের পথ ২০
একটি মানসিক প্রলাপ ২১
বাদশা সংক্রান্ত ২২
এপার ওপার ডিমনা নালা ২৩
প্রবুদ্ধ যযাতি ২৪
মহাষণ্ডীয় কাব্য ২৫
বৃষ্টিকে সামনে রেখে ২৬
ইতস্তত বিশ্বরূপ ২৭
পুরোনো বন্ধুর মত ২৮
আশায় বেঁচে থাকা ২৯
সাপ্তাহান্তিক ৩০
তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী ৩১
অথ স্বপ্নঘটিত ৩২
স্রোতের গভীরে ৩৩

হে আমার সম্মিলিত দুঃখ   ৩৪
বিষণ্ণতার পরিবর্তে   ৩৫
কারণ এরা শোভাযাত্রী   ৩৬
তাত্ত্বিক আখর   ৩৭
ঘুঙুর   ৩৮
দুই দরোয়ান   ৪০
আরশির সমুদ্রে একা   ৪১
জানুআরি ১৯৭২   ৪২
গোরাই ব্রিজের নিচে কয়েক মুহূর্ত   ৪৪
কাব্যবিষয়ক   ৪৬
অন্তর্গত চিকের আড়ালে   ৪৭
একটু হাসুন   ৪৮
নিজেকে লুকিয়ে রাখছি   ৫০
ধাঁধা   ৫১
মাতুল শকুনি   ৫২
কিছু ছায়ামূর্তি   ৫৩
বাড়ি যখন যেতে বলেন   ৫৪
একটি ফ্রেমের পটভূমি   ৫৬
দৃশ্যাত   ৫৭
বিঘোষিত শোক   ৫৮
দুঃখ এবং   ৬০
আনন্দের দিকে মুখ ফিরিয়ে   ৬১
অসুখ বিসুখ   ৬২
বিপরীত অবস্থান থেকে   ৬৩
নিহত ভালোবাসার জন্য   ৬৪

নামমাত্র রবীন্দ্রনাথ

কে হে তুমি বৃদ্ধ বট ছেয়ে আছ দিন রাত্রি আকাশ সংসার
মানবিক বিস্ফোরণে সংস্কার নামাঙ্কিত ছায়ারা এখন
পালাও পালাও তুমি প্রলম্বিত জটাজাল অন্ধকার নিয়ে
কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা আদি যুক্তিহীন মননের প্রাচীন মূঢ়তা।

আমরা তুলেছি ধ্বজা এ যুগের স্বচ্ছন্দদৃষ্টি নিজস্ব কবির
সৃষ্টি যাঁর অনবদ্য এবং সমৃদ্ধ নানা যান্ত্রিক বিক্ষোভে
প্রগতির উপাদান নির্ধারিত আধুনিক রসায়ন মতে
কেননা বিজ্ঞান ব্যর্থ প্রায়শই ঘটে যদি নিষ্ঠার বিচ্যুতি।

রবীন্দ্রনাথ ত মাত্র শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত নির্দিষ্ট প্রতীক
তাকেও ফেলছে ছেঁটে রাজনীতি ক্ষৌরকার শোধনের নামে
আমাদের নব হর্ষে উচ্ছ্বসিত জন্মদিনে সভায় ভাষণে
মাঝে মাঝে কোনো বোধে স্পর্শ করি গঙ্গাজল কবির নামের।

মায়ের মুখ

কিছুতেই মনে পড়ছে না
কিছুতেই না
ছবির কাছ থেকে সরে আসতেই
সব ঝাপসা সব কুয়াশা
তারপর ট্রাম বাসের মিছিলে
দুর্ঘটনা স্লোগান পোস্টারে
সব একাকার সব একাকার।

তোমার মুখ কেন মনে পড়ছে না মা!
অথচ তোমার মুখের প্রতিটি রেখা
এখন আমার চোখে
স্বপ্নের মত স্পষ্ট
কানে হাত চাপা দিলেই
বৃষ্টির শব্দের মত শুনতে পাই
তোমার শাসন তোমার আশীর্বাদ।

তবু তোমার মুখ কেন মনে পড়ছে না মা!
তবে এখন কি আমি
মৃত্যু আর জন্মের মাঝখানের
প্রগাঢ় অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত

বহুদিন ছেড়ে আসা গ্রামের পথ
স্পর্শ করি কয়েক মুহূর্ত
দুপাশে চষা মাঠ
মাঝে মাঝে আখ ক্ষেত সরষে ক্ষেত
হলুদে সবুজে একাত্ম।

আর সেই সব ক্ষেতের উপর দিয়ে
খেজুরগাছে মাটির নতুন ভাঁড়গুলো
আলতো ছুঁয়ে
কপোতাক্ষীর বিষণ্ণ স্রোতে
ভাসমান কচুরীপানার পাশে পাশে
আমার পাশে পাশে
ভেসে চলেছে
আশ্চর্য
আমারই মায়ের মুখ।

দীঘার দর্পণে

একটুখানি দূরেই এলাম
ঐ কোলাহল মাইক বিলাস
এখানে আর মানায় না হে।
বালির পরে ইতস্তত
পায়ের ছবি আঁকতে আঁকতে
ভাসতে ভাসতে ঘুম সকালে
ঝাউ বনকে ফেলে আসতে
ভালো লাগছে
ভালো লাগছে সূর্য ওঠার পথের দিকে
দু এক কদম এগিয়ে যেতে।
ফেরার পথে উদরপন্থী বঙ্গযুবক
জেলে ডিঙির খোঁজ নিচ্ছে
তেলের শিশি উপুড় করে
গায়ে ঢালছে
স্নানের ইচ্ছে দুহাত ভরে
লুফতে এখন ভালো লাগছে
জলের উপর শাড়ির ফানুস
ভাবতে আরো ভালো লাগছে
এবং এসব ভাবনাচিন্তে
ঘোলা জলে মানায় না, তাই
একটুখানি দূরেই এলাম।

শ্রাবণী সারঙ

আমার দিনের প্রান্তে যদি কেউ উদ্ধত তর্জনী
আন্দোলিত করে গিয়ে অকপটে রাত্রির কাছে
হৃদয়কে তুলে ধরে—আর তার সমস্ত গর্জনই
অস্ফুট উচ্ছ্বাসে যদি স্তব্ধ হয়, সময়ের ছাঁচে
সে প্রেম অক্ষয় হোক ; এই কথা বলে বারংবার
চেয়েছে সরিয়ে দিতে পুঞ্জীভূত মনের আঁধার।

আজকে নতুন পাতা শিরীষের শিরায় শিরায়
আলোর প্রবাহ এনে ঊর্ধ্বমুখী। আত্মমগ্ন গানে
সীমিত সময় এসে মিশেছে যে চোখের তারায়
কী গভীর আর্তি নিয়ে চৈত্র আজ উন্মন সেখানে।

তবু তার মনে মনে অগ্নিকণা প্রধূমিত হয়
আমৃত্যু প্রত্যাশা নিয়ে উদয়াস্ত বর্ণালী বিস্তার
(আগুন ঝরে না তাই রক্ষা পায় বিবর্ণ সময়)
আলোক-বিভ্রান্ত নারী, জানে না সে সীমা আকাঙ্ক্ষার।

হয়ত জানে না, তবু একদা সে পরিপূর্ণ প্রেমে
স্রোতস্বিনী আকুলতা বুকে বয়ে ছাড়বেই ঘর
মধ্যাহ্নের ধ্যানে মুগ্ধ কোকিলের স্বর গেলে থেমে
অথবা ভূতলে ভ্রষ্ট পাপড়িতে থামলে ভ্রমর।

যখন ভাঙল ঘুম বিকেলের মুছে গেছে রঙ
আকাশে বাজছে রিক্ত রিমঝিম শ্রাবণী সারঙ।

একদা হলুদপুকুর

আচমকা জানলার কাছে
বিদ্যুৎ ঝলক
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠি
সেই শান্ত মধ্যাহ্নের ছায়াটুকু নেই
দূরলক্ষ্য চাইবাসা রোড
নিঃসঙ্গ ভ্রমণে মত্ত
পূবদিকে জাম আর অশথের ফাঁকে
লাইন ডিঙিয়ে
অনির্দেশে
জাদুগড়া মুসাবান
মাঝখানে ধূসর প্রশস্ত পথে
ভাটিখানা কালভার্ট
ঝিরঝির নালা
সম্মোহিত বারিপদা হলুদপুকুর
আর সারা রাত
ছুটন্ত লরীর চোখে
মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলক।

সারাদিন পরিশ্রম
বেতের চেয়ারে
গা এলিয়ে বসে আছি তিনজন
চির আমি এবং অমিত
পথ জুড়ে নিমের সুদীর্ঘ ছায়া।
হঠাৎ প্রবল বেগে
বৃষ্টি এল
সামনে পাথুরে মাঠ মাইল দুয়েক
বাদামপাহাড় থেকে ফিরে আসছে
ঝমঝম যাত্রীবাহী ট্রেন

আরও দূরে
ছোটো ছোটো পাহাড়ের ঢেউ
ক্রমশ অস্পষ্ট হচ্ছে·
ডাইনে বনের মধ্যে
উঁকি দিচ্ছে আশ্রমের চালা
মনে ভাবি কৈশোরের গাঁয়ে বসে আছি
হয়ত আরও কিছু
আরও গভীর।

যাদুঘর থেকে
এ ছবি কি ফিরে আসবে কোনোদিন
কোনো ছবিঘরে !

আসছে বছর

বলেছিলে

আসছে বছর বাউটি দেবে

আসছে বছর কন্দুরে গো

বলেছিলে

আসছে বছর ঘটা করবে

লক্ষ্মী পুজোয়

আসছে বছর কন্দুরে গো।

কানের পাশে সাপ দুলছে

মাথার উপর বাদুড়

পায়ের নিচে ঐ দেখ না

ভাসছে সোনাগাই

এমনি করে বসে থাকতে

ভাল্লাগে না ছাই।

বলেছিলে

আর কখনো বান হবে না

ভাসবে না আর ভিটে মাটি

গরু বাছুর

ওসব বুঝি রূপকথার সেই রাজার কথা

কথার মত রাজাও যার সত্যি নয়

নইলে কি আর রাজার কথা মিথ্যে হয়।

মনে পড়ছে সেবারের সেই চড়ক

সন্ন্যাসীরা আগুনে দিল ঝাঁপ

বেঁচেও গেল

এমন কিছু ঘটে না কেন ভাগ্যে

গরীব হয়ে কি করেছি পাপ।

বলেছিলে

বারোমাসে একটি বছর

ফিরতি বছর কন্দ্‌রে গো

বলেছিলে

আসছে বছর

শক্ত করে ঘর বাঁধবে

আসছে বছর কন্দ্‌রে গো।

যেও না বাহিরে

কে সেই ভ্রষ্ট চিত্ত, কোথা সেই কামুক পথিক
এখন পশ্চাৎপদ ?   জীবনের পথগুলো ঠিক
চিনেছ ত ।   সাবধান, বুঝে চলো সময় সংকেত
ছদ্মবেশে চতুর্দিকে ঘোরে ফেরে পিশাচ ও প্রেত ।

তুমি বুঝি নটী, তাই নৃত্যছন্দে মত্ত বিভাবরী
সুনিপুণ কটাক্ষেও ভরবে কি হৃদয়-গাগরী
তোমার পশ্চাতে ছায়া সম্মুখেও ছায়ার বিস্তার
ছায়ায় আচ্ছন্ন করে পার হবে ক্ষুব্ধ পারাবার ।

কে তুমি ভ্রান্ত পান্থ, ফিরে যাও আপন কুলায়
জান না কুহকী আলো নিরন্তর দুর্বলে ভোলায়
নিজেকে প্রদীপ্ত করো চেয়ে দ্যাখো রাত্রির গভীরে
সময়ের পদক্ষেপ লিখে রাখো, যেওনা বাহিরে ।

শরীরী স্বপ্নেরা

শরীরী স্বপ্নেরা এই নগরীর পথে ঘাটে নিত্য প্রবাহিত
কখনো বন্যার বেগ কখনো উদ্ধত বহ্নি—অপার্থিব সব
শূন্যের অন্য নাম অথবা সে শূন্যতাও নয়, শুধু বিলম্বিত
নিরালম্ব প্রাণছন্দঃ শূন্যতাকে ভুলে যেতে বিচিত্র আসব।

অথচ প্রচেষ্টাহীন স্বাভাবিক বিস্মৃতিকে সত্য মনে হয়
সেদিনের মুগ্ধ চোখ—আজ তার ইতিহাসে ছায়াটুকু নেই
অনুপম হৃদয়কে ফেলে যাই, কাছে আসে আর এক হৃদয়
তাকেও অনন্য ভাবি—বার বার ছুঁয়ে যাওয়া সেই ছায়াকেই।

তবুও বিস্ময় নেই, এই নিত্য নাট্যরঙ্গে ক্লান্তি নেই মনে
আমার ইচ্ছার ছায়া বিঘূর্ণিত রঙ্গমঞ্চে আলোকে আঁধারে
তারা যদি স্বপ্ন হয়, সুরা পানপাত্রে তবু সেই ক্ষণে
রূপ রঙ রসে তারা উজ্জীবিত, মূর্ত তারা নিত্য অভিসারে

মহাভারতের পথ

এ পথের নাম মহাভারতের পথ
তুচ্ছ প্রলয়ে ভ্রান্ত যুধিষ্ঠির
ধারাবর্ষণে বন্যার সংকেত
তার চেয়ে খাঁটি শস্যের আগমনী

দুপুরে দগ্ধ ঘাসের মৃত্যুশ্বাস
দক্ষিণ থেকে জানলায় কর হানে
তবুও কেন যে বৃষ্টি নামতে যাবে
বুঝিনা বুঝিনা বিচিত্র প্রহেলিকা।

কোনো ক্ষোভ নেই ভুলেছি ক্ষুব্ধ হতে
জীবন ছড়ানো প্রশস্ত নভতলে
এ কেবল মনে ছিটানো শান্তিজল
স্ফুটনাঙ্কে শৈত্যের ছায়াবাজি।

মিছিল মানেই মিলিত ছিলার টান
একদা পৃথিবী আবেগে প্রকম্পিত
কম্বুকণ্ঠ এখন নিথর শান্ত
বিভীষণ গেছে তূণীর শূন্য করে।

এ পথের নাম মহাভারতের পথ
বিধি বিধানের ভগ্নপ্রাকারে কীর্ণ
পাষাণ ফলকে ক্ষোদিত অমৃতবাণী
নিভৃতে এখন আরশিতে মুখ দ্যাখে।

একটি মানসিক প্রলাপ

মনকে চেনেনা সে।
মধ্যাহ্নের রুক্ষতা যে কখন নিমেষে
সন্ধ্যার স্নিগ্ধতায় রূপান্তর হয়
তার কাছে এই এক পরম বিস্ময়।

তবু তাকে একদিন বিকেলের কাছাকাছি এসে
থমকে দাঁড়াতে হল
ভাবল সে—এ মেঘের দেশে
এমন শিল্পীর দেখা কদাচিত মেলে
মহামূল্য মনে হল জীবনকে আজকে বিকেলে।
পৃথিবী রূপসী আজো তবে
সে নারী স্পর্ধিতা আজো যৌবনের অমূল্য বিভবে

তাইত নিজেকে বুঝি ভেবেছে সে হয়ত রাজা-ই
মুহূর্তে নিষ্প্রভ হয় তুলনায় সব তুলনাই
বুঝল না এটা তার ছন্নছাড়া মনের প্রলাপ
কিনল সোনার দামে রক্তরাঙা একটি গোলাপ।

আজকে হঠাৎ দেখা : কতকাল—কতকাল পরে।

বাদশা সংক্রান্ত

এ বয়েসে কিছু ছেলে অসামান্য দারুণ বুদ্ধিতে।

পা টলছে গা টলছে তবু দেখছ কি শাহাজাদা চাল
এরই মধ্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে পৃথিবী শুদ্ধিতে
এবং যুবক বৃদ্ধে ডেকে বলছে—বাচাল বাচাল।

এ ছেলে বাঁচলে দেখো মরবে না ঠিক।

দৈববাণী ফলে গেল শত্তুরের মুখে দিয়ে ছাই
বাদশাও অতঃপর বুঝল সঠিক
ছলেবলে শাজাদার অবিলম্বে মসনদ চাই।

সভাসদ পাত্রমিত্র হেঁকে বলল—তা ভালো তা ভালো
বাদশার শিক্ষা বটে—একেবারে জ্বলন্ত আগুন
ঘরটা পুড়তে পারে তবুও ত পাওয়া যাবে আলো

সেই আশা বুকে নিয়ে খোদাবন্দ রাত্রি জাগুন।

এপার ওপার ডিম্‌না নালা

আসছ যাচ্ছ বসছ না এ কোন জ্বালা এ কোন জ্বালা
মেঘের মত ভাসছ শুধু এ কোন জ্বালা এ কোন জ্বালা
বুকের মধ্যে সাজিয়ে রাখা স্বপ্ন কিম্বা বিষের থালা
অকাল ঝড়ে দুলিয়ে দেয়া ভালোবাসার বৈঁচি মালা
সন্ধ্যেবেলার উষ্ণছায়া মিথ্যে আশায় টালমাটালা
গভীর রাতে একলা খাটে বনবাসের ঈর্ষা ঢালা
সব কথা যে লিখে রাখব এপার ওপার ডিম্‌না নালা
জলের সবুজ দাগ কাটে না এ কোন জ্বালা এ কোন জ্বালা।

প্রবুদ্ধ যযাতি

আমি ত উন্মুখ, শুধু
আকাংক্ষার শেষ রশ্মিটুকু
মুছতে দাও বিকেলের সাঁকোর ওপারে।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞাবন্ধ
কণ্ঠলগ্ন সতীত্ব কবচ
এপাশ ওপাশ করতে
জীর্ণ খাটে উত্তপ্ত ইশারা
যা নই তা নিয়ে নিত্য
নিঃশব্দ কাকলি।

অভিনয়ে অভিমন্যু
বাস্তবে একাত্ম সব—প্রবেশ প্রস্থান
ছেঁড়া সার্ট টানতে গিয়ে দারিদ্র্য বাড়ায়।

আমি ত উদ্যত, শুধু
আর একটু কমতে দাও ঝড়ের তান্ডব।
বহুদিন ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত আকাশে
চাঁদ উঠতে দেখিনি যে!
ভুলে গেছি সমুদ্রের বুকে
কেমন মন্ত্রের মত আশ্চর্য নৈশব্দ্য নামে
গ্রহণের পর
কেমন নির্লিপ্তি নিয়ে পাক খায়
জলের আকাশে প্রাজ্ঞ শংখচিল।

আমি ত প্রস্তুত, শুধু
নিসর্গের সাজঘরে নটীদের সাজ শেষ হতে
যা একটু দেরি
তারপর আমি এক প্রবুদ্ধ যযাতি।

মহাষণ্ডীয় কাব্য

সারাটাদিন রাগ অভিমান
সারাটা রাত উষ্মা
সব কিছু ত তুঙ্গে থাকে
এমনি প্রখর গ্রীষ্মে
চোখের জলে ভুলবে না যে
ভীষণ গোঁয়ার ভীষ্ম ।

আমরা যখন কোষাগারের
লুব্ধ খোজা রক্ষী
নাক ডাকাক না চিন্তাক্লিষ্ট
কৃপণ প্রভুপক্ষ
জীবন যদি বৃথাই যায়
পরম গতি যক্ষে ।

পালপাবনে আস্থা নেই
এমন মহাষণ্ড
চোখের সামনে নৃত্যরত
শূন্য উদাস ভাণ্ড
এখন শুধু অবশিষ্ট
তৃপ্তি পাওয়া পিণ্ডে ।

বৃষ্টিকে সামনে রেখে

একমুঠো শুকনো পাতা ছড়িয়ে বললুম
নিঃশব্দে হেঁটে যাও
থামলে দিলুম কোষাগারের চাবি
চোখ বেঁধে হাতে দিলুম প্রদীপ—
তুলে আনো নীলপদ্ম
নিস্ফল ফিরলে ধ্বনি উঠল—সাধু সাধু
ক্যামেরার লেন্সে নিবদ্ধ দৃষ্টি ত আমার দিকেই।

আসলে সব কিছুর মূলে সময়।

বুদ্ধদেব রায় 'চোখের ঝিনুক' কথাটায়
খুব মজা পেত
এখন উস্রি দেখে ফেরা
তুলনায় ত চেরাপুঞ্জি মরুভূমি
প্রতি মহালয়ায় কয়েকটি শব্দ
ফিরে ফিরে আসে।

তুমি কোন কাননের ফুল তুমি কোন গগনের তারা।

আমি কিন্তু বৃষ্টিকে সামনে রেখেই ছুটছি
ভেজায় কার সাধ্য!

ইতস্তত বিশ্বরূপ

পরিবেশটা পালটে নিলুম
সার্সি থেকে আয়না
আর যা কিছু সার্সি দেখাক
নিজেকে দেখা যায় না।

পরিবেশটা পালটে নিলুম
শহর থেকে গাঁ
ওম্মা, দেখি রান্নাঘরে
ধোঁয়াই ওঠে না।

পরিবেশটা পালটে নিলুম
আলাদিনের রাজ্যে
মেলানো ত দারুণ শক্ত
ইচ্ছা এবং কার্যে।

কাড়া নাকড়া বাজিয়ে দিলুম
ওরা ভাবল যুদ্ধ
সাদা মনের লোকেরা যে
জলকে বলেন দুগ্ধ।

পরিবেশটা পালটে বলি
দৈত্য মহাশয়
এই বোতলে বন্দী ছিলেন
তাই কখনো হয়!

বেরিয়ে না হয় এলেন, কিন্তু
কোথায় ছিলেন তা
ওখানে ফের না ঢুকলে
বোঝাই যাবে না।

পুরোনো বন্ধুর মত

দুরন্ত স্রোতের মধ্যে ভেসে যাচ্ছি
স্থির লক্ষ্য বলতে কিছু নেই
আগন্তুক স্থিতপ্রাজ্ঞ
ভূয়োদর্শীও বটেন
পার্থিব মালিন্য থেকে
শতহস্ত না হলেও
ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা
সাধ্যাতীত নয়।

বিশীর্ণ নদীর মত
সুস্থতাও পদ্মপত্রে জল
দেয়ালের লেখা আজ
মূর্খেরাও পড়ে দেখতে পারে—
ভবিতব্য ছড়া কাটছে ইঁটের ফোকরে!

চারদিকে ঘেঁষাঘেঁষি অট্টালিকা
মাথার উপর থেকে বিলুপ্ত আকাশ
নিকষ কাকের ডানা পূর্ব ও উত্তরে
হঠাৎ তবুও
পুরোনো বন্ধুর মত হাসতে হাসতে ঢুকে পড়ে
একফালি রোদ
—দেখছ ত ঠিক মনে আছে!

আশায় বেঁচে থাকা

আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টি প্রলোভন
বাতাসে নিমফুলে উদাস হাতছানি
পথের কালো পীচে রক্ত সমারোহ
আমরা কেন আছি থেকেও আছি নাকি
আশায় বেঁচে থাকা

আমরা পায়ে পায়ে যখনি পা মেলাই
গলার শিরা ছিঁড়ে যখনই গলা সাধি
দুপুরে গনগনে টাটকা আঁচ থেকে
ফুলকি তুলে নিয়ে যখনি বিড়ি ফুঁকি
আশায় বেঁচে থাকা

লোভের ধানুকীরা যতই তীর ছোঁড়ে—
অভাব অনটন বন্যা মহামারী
আমরা ছুঁড়ে দিই মিলিত পাশুপত
এখন শুধু সেই
আশায় বেঁচে থাকা।

সাপ্তাহান্তিক

আজকাল
কঠিন প্রত্যয় নিয়ে ধার করি
নিদারুণ গবেষণা সারাটা সপ্তাহ
শেষ দিনে পুষ্পিত চেতনা
তেজ ও বলের চিহ্ন
চতুষ্পদে আশ্চর্য সঙ্গীত।

আজকাল
সজীব ঋজুতা নিয়ে বলতে পারি
ঠিক আছে—এ হপ্তা গেলেও
সামনে কুইন্স কাপ
বুঝে নিও সুদে ও আসলে।

আজকাল
কান্নার পরিবর্তে
ধার করা শেষ কপর্দকে
কঠিন প্রত্যয় নিয়ে
গুরু শিষ্যে গলাও ভিজাই।

তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বী

ওরা তিনজন দীর্ঘ সময় বসে।
কি হে সালিস কিসের ?
তিনজনেরই গলায় কণ্ঠি কপালে ত্রিপুণ্ড্রক
হাতে সুতোয় বাঁধা সানাইয়ের পোঁ।

এজ্ঞে আমাদের মাল ভাগিয়ে দিন
সুর জমছে না।

প্রথম কণ্ঠি নৈকষ্য বোষ্টম
গলায় হাত দিয়ে বলল
এগুলি মুনিব চেনে না।

দ্বিতীয়টা বোধ হয় নেশাটেশা করে
বলল—তিলকের দশা দ্যাখেন
এমনি করলে বাবু খেলা যায় !

তিন নম্বর মহা ঘোড়েল
হাতের যন্তরগুলো মিশিয়ে দিয়ে বলল—
কোনটা কার চিনতে লারছি।

তারপর নামাবলী ফেলে
যে যার ঝুলি ঝাড়ল
করতাল খঞ্জনি আর গাপগুপ নিয়ে
ফড়িঙের মত লাফাতে লাফাতে
বেরিয়ে পড়ল সংকীর্তনে।
আমি পিছন থেকে বৃথাই গলা ফাটালুম
কি হে সালিস কিসের
সালিস কিসের হে…।

অথ স্বপ্নঘটিত

এবার সত্যি বলুন মশাই
দাঁড়াব না শুয়ে পড়ব
বলিনি ত গপ্প শুনে
হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরব
যেটুকু যা বায়না করা
নেহাৎ সে সব প্রাণের দায়ে
ভালোবাসার বুলি ফুটবে
দাঁড়াই আগে নিজের পায়ে
দেখলাম ত সূক্ষ্ম সুতোয়
বত্রিশ মন ঝুলিয়ে দিলেন
ছিঁড়লে সে যে পড়বে কোথায়
আগে কি আর ভেবেছিলেন
এখন কি স্যার নিন্দে হবে
মাছির জ্বালায় লেজ নাড়ালে
শকুন পড়াও বিচিত্র নয়
আর কিছুকাল নাক ডাকালে
শুধু ইচ্ছেয় মেঘ নড়ে না
স্বপ্নে কি তাই থলি ভরব
এবার সত্যি বলুন মশাই
দাঁড়াব না শুয়ে পড়ব।

স্রোতের গভীরে

প্রত্যেকে নিঃসঙ্গ দ্বীপ
কারো ঘরে কুপী জ্বললে
ছায়াটাও আশ্চর্য শীতল

হয়ত আমরা কেউ কাউকে চিনি না।

প্রণামে আনত দেহ
কে ওখানে সাগ্নিক পৌরুষ
কে ওখানে শ্বেত পারাবত
কৃতাঞ্জলী অর্ঘ্য নিয়ে মেঘ ডাকছে
উদ্যত সূর্যকে
একই দর্পণে লগ্ন গোলার্ধের অভিন্ন প্রত্যয়
প্রত্যেকে ভারতবর্ষ ভিয়েৎনাম বাঙলা কলকাতা।

আমরা স্রোতের মধ্যে একাকার
সুদক্ষ ডুবুরী
কেননা সমস্ত স্রোতে
হো চি মিন নামের পতাকা।

হে আমার সম্মিলিত দুঃখ

দারুণ মধ্যরাতে প্রার্থনার মন্ত্র ভুলে যাই
হে আমার সম্মিলিত দুঃখ !

কড়িকাঠ অসম্পূর্ণ খিলান
অবিন্যস্ত তাকের উপর থেকে টুপটাপ
লাফিয়ে নামে ভীষণ পরিচিত দেবতারা
উষ্ণীষে হোঁচট খেতে থাকে শালীন অন্ধকার
জানুয়ারীর ভোরে গঙ্গাস্তোত্র পাঠের মত
কাঁপতে থাকে আমার তাঁবুর সংসার
তুষারপাতের নিঃশব্দ পরিচর্যায়
ডুবে যেতে যেতে দেখি
সেই সব ভীষণ পরিচিত দেবতাদের হাতে অভয় মুদ্রা
আমার নির্ভরতার সৌধশীর্ষে
হয়ত এখন শিউলি ঝরছে।

তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না বলে
দারুণ মধ্যরাতে প্রার্থনার মন্ত্র ভুলে যাই
হে আমার সম্মিলিত দুঃখ।

বিষণ্ণতার পরিবর্তে

সবাই নিঃসঙ্গ নয়
দুরারোগ্য নির্জনতা
অনেকেরই স্কন্ধলগ্ন নয়
অনেকে এখনো সায়াহ্ন নিসর্গ দেখে
শিশুদের মত করতালি দেয়
ইডেনের পোষাকি সবুজ
বাতি জ্বালে চোখের তারায়
উৎসবে পরীর মত প্রসাধন করে
বন্যতা ও সভ্যতাকে রেখে দিয়ে একই শো কেসে ।

হালকা মেঘের মত
বিষণ্ণতা উড়ে যাচ্ছে দ্রুত
প্রণয় আগের চেয়ে অধিক বিশ্বাসী
মায়ের স্মৃতির মত পউষ পার্বণ
রবীন্দ্র উৎসব আর শুধুমাত্র নৃত্যনাট্য নয়
চৌরঙ্গী উদ্বেল হয় ছাতিমের ঘ্রাণে
শত্রুদের সাথে উঠছি বসছি বন্ধুর মতন
ছোটোখাটো দোষ ত্রুটি ভুলে যেতে
সবাই প্রস্তুত

কেননা মানুষ চায় হয়ে যেতে
মানুষের মত

কারণ এরা শোভাযাত্রী

আমি এখন শুনতে পাবো ।

এতক্ষণ মনের মধ্যে
হাওয়া শূন্য হাঁড়ির মধ্যে
মাঝে মাঝে কাতরে ওঠা
শব্দ বিহীন ইচ্ছেগুলো
হাত পা ছুঁড়ে শাসাচ্ছিলো
এখন হাঁড়ির বুকের কাছে
ছোট্ট একটা ছিদ্র হতে
ইচ্ছেগুলো হাউই হয়ে
আকাশে নখ শানিয়ে নিলো
এবং তখন অনায়াসে
বিকেলটাকে সেতার করে
পিড়িং পিড়িং তান তুলল ।

কারণ এরা শোভাযাত্রী ঃ
শূন্য ঘরে শুনতে পাওয়ার
ইচ্ছেগুলো

তাত্ত্বিক আখর

তোমাকেই শরণ করে পড়ে আছি

গুরু দেখে

দানাপানির অভাব হবে না
রাঙা চোখেই মালুম
থাকবার অসুবিধে কি
এবার বেজায় গোমড়ক
পরিচয়ের প্রয়োজন নেই
মনোবিজ্ঞানীরা সার্টিফিকেট দেয়া ছেড়েছে
হৃদয় টিদয়ের ব্যাপার হলে
চাঁদা তুলতেও রাজি

শুধু তত্ত্বের কথা বোলো না গুরু
তোমার মুখে ওটা আর মানায় না।

ঘুঙুর

ঘুঙুরের শব্দ শুনে ভোর হয়।
গত রাতে ঘুমের আগেও
এই শব্দ
হয়ত বা কোনো পটিয়সী
মহড়ায় মেতে আছে
কুয়াশা আবিষ্ট ভোরে
হয়ত শিশিরে লীন
পায়ের শব্দও।

ঘুঙুরের শব্দে কেন শৈশব জড়িয়ে থাকে!
কোনো মধ্যরাতে
কে আমাকে নাম ধরে ডেকেছিল
আমার চৈতন্য থেকে
ধূসর জোছনার শর ছুটে গিয়ে
আকন্দ পাতায়
অলৌকিক নৃত্যে মেতেছিল।

ঘুঙুরের শব্দে কেন স্বপ্ন ভেঙে যায়
ঘরের দাওয়ায়
আছড়ে পড়ে তেলেঙ্গানা কাছাড়ের ঢেউ
জ্বলন্ত শপথ ভুলে
মৈত্রীর রাখী ছেঁড়ে কলকাতা
ঢাকায় আবার গুলি চলে
মতিউল কাদেরের খুনে
কালো পিচ লাল!

ঘুঙুরের শব্দকে ডুবিয়ে
হাঁকপাড়ে বীভৎস নাপাম

পায়রার ছদ্মবেশ খুলে
চবুতরা থেকে
উড়ে যায় ক্ষুধার্ত ঈগল
হ্যানয় দানঙে
দাউ দাউ ধানক্ষেত বাস্তুভিটা
ঝলসানো মাংসের ঘ্রাণ
কুয়াঙবিনের মত
দস্যুতায় বিক্ষত শিশুরা
ধমনীতে মাদল বাজায়।

ঘুঙুর কি যুদ্ধের মাদল!

দুই দরোয়ান

উঠতে বসতে সেলাম
রাত দুপুরে বিবেকপন্থী
ঘোমটা খোলা হনুমন্তী
আরশি তুলে হিসেব মেলায়
কটটুকু কি পেলাম ।

খুনখারাবি নুনপান্তা
মন বাবাজী সবজান্তা
এপার মাঝি ওপার ডিঙি
মধ্যিখানে বাতি
জ্ঞান দিচ্ছ কে তুমি হে
আলিবর্দির নাতি ।

চলছি শুধু, ঘুম ত নয়
প্রেম মানে কি অবক্ষয়
এই তত্ত্ব শেখায় এখন
সদ্যজাত শিশু
ভাবের ঘরে দুই দরোয়ান
পিপু এবং ফিশু ।

আরশির সমুদ্রে একা

দরজায় কড়া নাড়ছ কে তোমরা আলোর দুলালী ?
আমি সারাদিন উৎকর্ণ আশায় বিশ্বাসকে বেঁধে রাখছি
অবিশ্বাস্য কোমল সুতোয়
আমি কতদিন রিনরিন যন্ত্রণাকে ভুলে আছি
মুগ্ধ দ্রব্যগুণে !

দ্রুত করাঘাতে ডেকে ওঠে—কে আছো ভিতরে
গলায় ঘুঙুর শব্দ, হাতে বাজে বলয়ে সেতার
আমি আছি আমি আছি
শরক্ষেপ করে চলি নিঃশব্দ চিৎকারে
অবশেষে শ্রান্ত হতাশায়
বকুল কুড়ানো সাধ ফিরে যায় ম্লান সন্ধ্যাবেলা ।

আমি কেন বসে আছি ম্লান সন্ধ্যাবেলা
কেন বসে আছি
সুধারসে প্রতিশ্রুত হে আমার আবিষ্ট সময়
অফিস কাছারি সেরে এলে—ধুয়ে এসো ক্লান্ত ইচ্ছাগুলি
আমি ততক্ষণ কোলে করে বসে থাকব প্রসন্ন অতীত
স্মৃতি থেকে ঝরে গেলে ফুলসাজ চন্দন তিলক
নগ্নতাকে লুকাবো কোথায় !

দরজায় কড়া নাড়ছ কে তোমরা আলোর দুলালী
আমি আরশিব সমুদ্রে একা সম্মোহিত বসে আছি
বসে থাকব বলে ।

জানুআরি

রিক্সা-না-পাওয়া-আশংকা ছিল
কাঁধে ভর করে
সন্ধ্যার পরে বাস থেকে নামা
তবুও রক্ষে — রিক্সা মিলল।

কলকাতা বাসে চাঁদকে চিনি না
আজ একাদশী
ধু-ধু জোছনায় ঘুমন্ত পথ
প্যাঁচা উড়ে গেলে চমকে ওঠে
যেন খসখসে আওয়াজ উঠল
আসশ্যাওড়ার ঝোপে
ছেলেটা দারুণ ভয় পেয়ে গেছে
অকারণে করে ক্রিড়িং ক্রিড়িং।

এখন চলেছি সোজা উত্তরে
কাঁদুড়িয়া থেকে।
পথের দুপাশে টুকরো দেয়াল
মুখ থুবড়িয়ে মাটির কলসী
নিকোনো দাওয়ায় হা করা ফাটল—
খেয়ালী ছাত্র ইতিহাস খুলে
মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পা থেকে
ছবি কপি করে।

তখন রিক্সা পাকা পথ ছেড়ে
গ্রামের পথে
গাছপালা আর ধুলোয় মেশানো
মুগ্ধ গন্ধ

ব্রিজ থেকে দেখি জলের মাদুরে
পা ছড়িয়ে বসে সুন্দরী চাঁদ
ধান কাটা মাঠে খুঁজতে খুঁজতে
লক্ষ্মী পায়ের ছাপ
গন্তব্যে পেঁছে গিয়েছি ।

এখন ফিরছি
জোছনায় নয়, উজ্জ্বল রোদে
বাঁশপাতা আর কঞ্চিতে ঘেরা
কৃপণ আড়াল
কাগজের ছেঁড়া শিকল পতাকা
বাতাসে উড়ছে
অশথের গোড়া সিঁদুরে রাঙানো
কোথাও দেখছি পলাশের গায়ে
কাঁচা অক্ষরে নাম ।

পথের দুপাশে
ঘরের চালাটা কাত হয়ে পড়ে
বাঁশের খুঁটির আশ্রয় নিয়ে
তখনো একটা কচি লাউডগা
আকাশে উঠছে ।

গোরাই ব্রিজের নিচে কয়েক মুহূর্ত

অনেক হেঁটেছি
গতকাল দশ, আজ
কম করে ছ সাত মাইল
শিলাইদহের নামে এই উন্মাদনা
অতএব স্তিমিত এখন।
রাধু আর শংকরেরা
পা ছড়িয়ে বসে গেছে
গঙ্গাফড়িঙ-পাখা
তির তির অগভীর জল
মানুষ বোঝাই করে
মালগাড়ি পার হয়ে গেলে
শূন্য আরো শূন্যতায়।

মূলত ভাসি না কেউ
বালির চড়াই ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে
তবুও না
কোথাও বিশ্বাসটুকু আঁকড়ে ধরে
লক্ষ্য স্থির রাখি।
তা না হলে
পরশু কেটেছে যশোর টাউন হলে
সাহিত্য ও প্রণয়ের বিমুগ্ধ হাওয়ায়
হান্নান রমেশ নানটু
অধ্যাপক শরীফ হোসেন
আজীজুল হক—নাম মাত্র নন।
গতকাল লালন মাজারে
পঙ্‌ক্তিভোজ গান আর
হৃদয়ের পূর্ণিমা কোটাল।
এই স্বাদ কতদিন পরে!

আর আজ
প্রায়-মধ্যাহ্নের এই শ্রান্ত-মুগ্ধতায়
ডুব দিয়ে বসে আছি আমরা ক'জন
সামনে আরশি ধরে
ক্ষীণ কটি রূপসী গোরাই।

কাব্যবিষয়ক

কবিতা কি লেখার জিনিস কিম্বা শুধু ভাবনা
মাত্রা মেপে মিলিয়ে দিচ্ছে পুরী এবং পাবনা।
একেই নাকি কাব্য বলে! না হে পড়ি শটকে
মারছে এরা শাস্ত্রটিকে ফাঁসীর কাঠে লটকে।
ধরে নিলাম মলয় ঘাস ভীষণ অ্যালার্জিক
চাঁদের আলোয় উদরপূর্তি হয়না এটা ঠিক।
লেকের জলে পা ডুবালে সর্দি কিম্বা সর্প
প্রাচীনেরা ভেঙে গেছেন অর্বাচীনের দর্প।
তাই বলে কি ফুরিয়ে গেছে হৃদয় নামে পণ্য
ভালোবাসার লঙরখানার বুভুক্ষুদের জন্য!
বুঝলে না হে, অন্যখানে মন হয়েছে বন্ধ
ফুটবে কি আর ছাইয়ের গাদায় কাব্য নামক পদ্ম
সব কবিরা ভজছে এখন কলিযুগের রাম
ওদের প্রাণে জোয়ার আনে ভিয়েৎনামের নাম।

অন্তর্গত চিকের আড়ালে

সবাই সজাগ থাকো—
হেঁকে বলল রাতের প্রহরী
বার বার একই শব্দ
ফিরি করে ফিরে গেলে শেষে
এদিক ওদিক থেকে
দু চারটে জানলা খোলা হলো
কি হলো কি হলো বলে
মিহি মোটা গলা কিছু
প্রশ্ন ছুঁড়ল নির্জন সড়কে
তারপর স্বপ্ন ভেবে
যে যার কপাট এঁটে
কুঁজোগুলো খালি করল
ঘাম মুছল স্বস্তির রুমালে।

রাত্রির বিভীষিকা
সকালেই ভুলে যাওয়া ভালো
এই নীতি মেনে নিয়ে
নিত্যকর্মে মগ্ন হয়ে গেল
আ-শিশু বৃদ্ধেরা
দেয়ালে টাঙিয়ে রাখল
ভবিষ্যৎ কল্পনার ছবি—
তপোবনে খেলা করছে
সমৃদ্ধির হরিণ শাবক।

এবং তখন
অন্তর্গত চিকের আড়ালে
প্রহরীর ইচ্ছা ঘুরছে
রাজবেশ পরে।

একটু হাসুন

এই রোয়াকে চলে আসুন
একটু কষে আড্ডা দিই
চতুশ্চোখে দেখে দেখে
রাষ্ট্রনীতির কসাইদের
গোমড়া মুখের পর্দা ছিঁড়ে
একটু হাসুন
দু এক সময় হয়নি মনে
ওদের কাছে বুদ্ধবাদের দীক্ষা নিই ?

দেখুন, আমরা দিব্যি আছি
আগের কালে তিথি তারার
লগ্ন থাকত পঞ্জিকাতে
নাকের ডগায় চশমা টেনে
দেখতে হতো কোথায় আছি ।
এখন সে সব আপদ গেছে
বাইস্কোপের খোপের মধ্যে
যা খুশি তাই দেখতে পারি
যুধিষ্ঠিরের বেচাল যখন আইনসিদ্ধ
সইবে কি কেউ অপগণ্ড
বার্তাকু আর অলাবুদের খবরদারি ।
কলার তুলে বুক ফুলিয়ে
যেমন খুশি করলে মানে
ইতর জনে মানতে বাধ্য
কারণ তাদের সমর্থনও
হাজির আছে সংবিধানে ।

অফিস ফেরত কুর্তা ছেড়ে

এই রোয়াকে চলে আসুন

প্ল্যান করা সব গোলকধাঁধায়

মিথ্যে ঘোরা

নড়তে গেলে লাইন ভাঙার

শংকা ছাড়ুন

গোমড়া মুখের পর্দা ছিঁড়ে

একটু হাসুন।

নিজেকে লুকিয়ে রাখছি

সবুজ আলোটা দুলতে
গলা থেকে হার খুলল
কানে হাত দিতে
ঝলসে উঠল অনামিকা
কিছুক্ষণ থেমে গেল
অবাধ্য কংকণে
অবশেষে সব কিছু
ভরে ফেলল ছোট্ট বটুয়ায়
ক্লান্ত মুখে রুমাল বুলিয়ে
হাই তুলে
দেখাতে চাইল
নিতান্ত নিঃশংক সে
পরন্তু সমস্তটাই
সারা গেছে বেশ সংগোপনে ।

আমরা সবাই জানি
প্রধানত বিষণ্ণতা
স্মৃতির বাহন
স্বল্পালোক অপরাহ্ণে
যা কিছু নিজস্ব ছিল
তুলে রাখছি বিষণ্ণ মোড়কে
চতুর্দিকে ধূলির ভিতরে—অন্তরীক্ষে
ওৎ পেতে বসে আছে
নিরুচ্চার লোলুপ শৃগাল
আমরা সবাই জানি,
তবুও প্রত্যেকে
নিজেকে লুকিয়ে রাখছি
পরভৃৎ নিজের আড়ালে ।

ধাঁধা

গুরু আমায় বসতে দিলেন পিঁড়ি
আমি বললাম—ছিঃ
এই কি গুরুর কাজ
গুরু বললেন—তা হয়েছে কি
ব্যাপারটা তো একই
ভিন্ন শুধু সাজ।

না মহারাজ
আমি বললাম, মানতে রাজি নই
চাল কলাটা পুরে নিজের ঝোলায়
আমার মুখে মাখিয়ে দেবেন দই !

গুরুর
গুণও আছে অবিশ্যি
মাছ খেয়ে মুখ ধুয়ে বলেন
খেলাম নিরিমিষ্যি
পুণ্যলোভী পাপের ভক্ত
কেননা পাপ বেজায় শক্ত
তারই হাতে গুরুর টিকি বাঁধা

পিঁড়িই দিন সিঁড়িই দিন
নিজের কাছে নিজেই গুরু
ধাঁধা।

মাতুল শকুনি

তুমি যে কৌরব-মিত্র নও, জানি হে মাতুল
আর জানি সুনিপুণ তস্করের মত
তার কোনো প্রমাণ রাখোনি।
গৌড়জন বিশ্বাসে অটল ছিল
তুমি গান্ধারী-অনুজ এবং কৌরব-সখা
যদিও আমরা প্রতিদিন
ভাঙছি আর গড়ে তুলছি বিশ্বাসের অসংখ্য মিনার
এবং তুমিও অখণ্ড অটুট নও।
মঞ্চের মোহিনী আলো—কিছু কিছু স্বগতোক্তি—
তুমি নাকি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দেবে
আমাদের কাছে এটাও মোহিনী
কেননা, শত্রুকে বুঝি তার চাতুর্য ও ক্রূরতা দিয়ে
কল্যাণকামীর বেশে তোমার শত্রুতা
ঘৃণার চেয়েও ঘৃণ্য।

মানবতা দূরে থাক
কারণ সবাই আত্মসুখে বীতস্পৃহ নয়
রক্তের গভীরে তবু যে প্রত্যাশা
প্রতিদিন অঙ্কুরিত হয়
তার নাম আত্মীয়তা।
তুমি যাকে রাষ্ট্রনীতি বল
সে ত অনাবৃত নৃশংসতা
নরহত্যা-অভিলাষী কাপালিকও
নিজেকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করে
সে কোন্ ঈশ্বর!

মহাভারত-চ্যুত হে মাতুল শকুনি
তুমি আজ কোন স্বর্গে আছো!

কিছু ছায়ামূর্তি

নিঃসঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে
আমরা দাঁড়িয়ে—কিছু ছায়ামূর্তি
সামনে মার্কারির রৌদ্রে
হাত পা ছড়িয়ে অতিকায় তিমি
এবং তাকে ঘিরে কর্মব্যস্ততা
পেট্রোল-ট্যাঙ্কার ট্রলি
শেষ মুহূর্তের পরিচর্যা।

নিচের করিডোরে ইতস্তত যাত্রীরা
উপরের অন্ধকারে গুঞ্জন
ওই ত ওই ত।

সগর্জনে তিমির ঘুম ভাঙল
তখন ঠিক আটটা পনেরো
দূরে সারিবন্ধ জানলার মধ্য দিয়ে
পরিচয়হীন উৎসুক চোখ
অন্ধকারের দিকে।

রেনি-ডে পাওয়া ছাত্রের মত
রানওয়ের এমাথা ওমাথা
ছুটে এল তিমি
তারপর দ্বিগুণ গর্জনে মাটি ছাড়ল
মাথার বড় লাল মণিটা
ক্রমশ ছোট হতে হতে
জোনাক হয়ে আসছে

নিঃসঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে
আমরা তখনও দাঁড়িয়ে—
কিছু ছায়ামূর্তি।

বাড়ি যখন যেতে বলেন

বাড়ি যখন যেতে বলেন
ভেবেই বলেন
দোর পেরোলে মোমবাতি আর
হাতপাখাটা এগিয়ে ধরেন
জলযোগের পর্ব সেরে
এটায় ওটায় জড়িয়ে পড়েন।

যেমন ধরুন—রেকর্ড বাছাই
সূক্ষ্ম রুচির লোকের যা চাই
বড়ে গোলাম অশোকতরু
কেষ্টবাবুর নদের নিমাই
রক-এন্‌-রোল কিশোরকুমার
এ-কটা ত শোনাই চাই।

আরও আছে ফটোর সখ
তকমা আঁটা অ্যালবামে সব
সিমলা দিল্লী চাঁদনী চক
বিয়ের ছবি বেড়ালছানা
দারুণ চিত্ত উদ্দীপক।

বাড়ি যখন যেতে বলেন
ভেবেই বলেন
আপনি যেমন সোজা মানুষ
সোজাই চলেন
বাড়তি চা-টা এগিয়ে দিয়ে
পাণ্ডুলিপির ফাইল খোলেন।

ছেলের ছড়া নাতির আঁকা
মেয়ের বোনা বালিস-ঢাকা
রোডেশিয়ান কুকুরটাকে মাথায় তোলা—
এ সব যদি না দেখালেন—বৃথাই আনা
জলের উপর নিপুণ তুলির নকশা টানা।

আপনি যখন দেশভক্ত
দেশের কথা ভেবে তোলেন মুখে রক্ত
তেলেভাজার সাথে হয়ত
ধরিয়ে দেবেন জুয়ার তাস
বলিয়ে নেবেন দেশের এখন
আসল নেতা জয়প্রকাশ।

বাড়ি যখন যেতে বলেন
ভেবেই বলেন
আপনি যেমন সোজা মানুষ
সোজাই চলেন।

একটি ফ্রেমের পটভূমি

আমি তার সব কথা বুঝতে না পেরে
দেয়ালে বাঁধিয়ে রাখি।

সে যখন ঠোঁটের উপর তুলে ধরে নিষ্কম্প তর্জনী
ছল ছল হেসে ওঠে সরোবরে হংস যুবকেরা
কচুরিপানার দ্বীপে অতি দ্রুত ভূমি চায় উদ্‌ভ্রান্ত নোঙর।

কে তুমি দাম্ভিক রিপু, কথা বলো। দিই না জবাব
যাদুকে রোপণ করি দক্ষিণ বাতাসে—মুগ্ধ যূথী মূলে
দুঃসহ উদ্যমে আলোড়ন তুলি সদ্য-মুকুলিত গ্রীষ্মের শাখায়।

সে তার প্রখর স্বপ্ন নিবেদন করে বলেছিল
এখন ঘুমাও, যতক্ষণ পারো যতদিন পারো
আমার সঞ্চয়ে আর আপাতত কোনো স্বপ্ন নেই।

যেহেতু নিঃস্বতা কোনো তুলিতে ফোটে না—কলমেও নয়
আমি সেই নগ্ন বিষণ্ণতা আলগোছে ফ্রিজে তুলে রাখি
সে আমাকে 'রিপু' বলে নামাবলী ছুঁড়ে দিয়েছিল

আমি তাই তার কথা বুঝতে না চেয়ে
দেয়ালে বাঁধিয়ে রাখি।

দৃশ্যান্ত

আপাতত পর্দায় কোনো ছবি নেই।
হতে পারে দু-দণ্ড আগেও
ওখানে তাণ্ডব চলছিল
সমাজ জন্তুর মুখের আদল পালটাতে
দু-পক্ষই সমান জঙ্গী
শান্তির মাদুলি নিশানে লটকে
দু-দিকের খড়ের চালায় হাউই ছুঁড়ছিল

এবং প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও।

কিন্তু এই মুহূর্তে
যান্ত্রিক দুর্বিপাকে
পর্দায় অতলান্ত শুভ্রতা
শুধু দু-চারটে তেলচিটে ছোপ
মাঝ বরাবর জোড়ের লম্বা দাগটা
বড় বেশি সাদা।

পর্দা ত এখন সাদা-ই
তবু দুটো হাড়বজ্জাত মাছি
বার বার উড়ছে আর বসছে
উড়ছে আর বসছে।

বিক্ষোভিত শোক

স্বদেশী ও বিদেশী বন্ধুরা
বিশ্বাস করুন
নেরুদা নিহত নন—মৃত মাত্র ।

যদিও আমরা
সূর্যের রশ্মিকে ভয় পাই
পিঞ্জরে আবদ্ধ করি প্রাণের উচ্ছ্বাস
উদ্ভাসিত তলোয়ারে
আঁধারের প্রলেপ লাগাই
আমাদের বাসনা তবুও
নেরুদা অমর হোন ।

আমরা বিশ্বাস করি
মানুষ নিজেই ডাকে
নিজের মৃত্যুকে
তা না হলে কেন এত চপলতা ।
লিখছেন ! বেশ লিখুন না
যুদ্ধ শান্তি মানুষের সুখ দুঃখ
রক্তাক্ষরে লিখে যান ।

বিশ্বমত যাই হোক
পিনোচেত ষড়যন্ত্রী নন
ঈগলের নখে বিদ্ধ পারাবত
তাঁর সৃষ্ট শান্তির নতুন প্রতীক ।
তবু কেন পিনোচেত নয়—
বিশ্ব আজ উদ্বেলিত নেরুদার নামে ?
কে নেরুদা !
নেরুদা কি রাজনীতিবিদ্

নেরুদা কি মানব দরদী
না কি স্বাধীনতা যোদ্ধা
পাবলো নেরুদা।

না, নেরুদা কবি।
মনে রাখবেন রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি
কখনো কবিতা নয়
দার্শনিক হলেও নেরুদা
এই নীতি বিস্মৃত হয়েছিলেন
তাই মৃত্যু।

যে যাই বলুক
বিশ্বাস করুন
নেরুদার মৃত্যু স্বাভাবিক
আমরাও চাই
নেরুদা অমর হোন।

দুঃখ এবং

তোকে আমি শাস্তি দিলাম
তোর ঝুড়িতে যত দুঃখ
ডবল দামে কিনে নিলাম
আমি এখন খাস তালুকে
দুঃখগুলো রোপণ করে
ঠিক দুপুরে জল ঢালব
কাক তাড়াব শিউলি ভোরে ।

তোকে আমি শাস্তি দিলাম
আমার ফসল তোর দোকানে
ডবল দামে বেচে দিলাম
যেখানে তোর দুঃখ এখন
সেইখানে ত আমি ছিলাম ।

আনন্দের দিকে মুখ ফিরিয়ে

প্রায়ই
দুঃখকে চিৎকার করে ডাকি
দুঃখ তুমি কোথায়
আসলে তখন
আমরা আনন্দোদ্ভাসিত মুখে
সূর্যের দিকে তাকিয়ে।

ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
পাঁচিলের সংকীর্ণ আকাশ
ঢেকে গেলে
চোখে রুমাল চেপে
দেখতে চেষ্টা করি
মা কোন্ চিতায় শুয়ে ছিলেন।

হিংস্র ইস্পাতে
আকাশ এফোঁড় ওফোঁড়
সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ যুদ্ধের দামামা
কৈশোরের আনন্দকে
শিশুর মত বুকে চেপে
সন্ত্রাসে ছুটে যাই
স্টেডিয়ামের নিচে।

আনন্দের দিকে মুখ ফিরিয়ে
প্রায়ই
দুঃখকে চিৎকার করে ডাকি
দুঃখ তুমি কোথায়।

অসুখ বিসুখ

আমার একটা অসুখ আছে
ধর্মাবতার
সেই অসুখে ফুলছি কেবল ফুলে যাচ্ছি
মনের মধ্যে গুবরে পোকা
তবু ফুলের গন্ধ পাচ্ছি।

লক্ষণে যা মিলে যাচ্ছে
রোগটি মোটে সহজ নয়
কাকে কাকের মাংস খাচ্ছে
বাঁদরঅলা খাঁচার মধ্যে
নিজেই এখন বাঁদর নাচছে।

আমার একটা বিসুখ আছে
মহামান্য
সেই বিসুখে পুড়ে যাচ্ছি জ্বলে যাচ্ছি
দারুণ অনটনের মধ্যে
পরমান্ন পেসাদ পাচ্ছি
ভাঁড়ে যখন মা ভবানী
ভাষণ শুনে শান্তি পাচ্ছি।

অসুখ বলতে
অনেক সুখের কথায় ভোলা
বিসুখ বলতে
বিশেষ সুখের ধর্মগোলা।

বিপরীত অবস্থান থেকে

ওভাবে নয়
আসুন, এদিক থেকে দেখা যাক
ওই ত দূরে বনরাজিনীলা স্বপ্ন
ইচ্ছার মত মসৃণ স্রোতস্বিনী।

ও চাঁদ চোখের জলে লাগলো জোয়ার।

ওদিক থেকে নয়
দেখুন দেখুন
কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে দৃশ্যের জগৎ
দুঃখকে সুখের আর
মন্দকে ভালোর তুলাদণ্ডে
মাপা হচ্ছে
কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে অনুভূতির পশুশালা।
দেখুন দেখুন
নামী ড্রেসার
দারুণ সুলভে প্রসন্নতা ভাড়া দিচ্ছে
সার্কাসি পটুতায় আদর্শ ঝুলছে
বাসের হাতলে
চৌমাথায় মাত করছে সদালাপী ভোমরা।

ওদিক থেকে নয়
জল্লাদের মালা আর হাড়িকাঠ যখন
নিকট কুটুম
আসুন, এদিক থেকেই দেখে নিই
সুরম্য জীবন।

নিহত ভালোবাসার জন্য

সেই আশ্চর্য শিকড়টা দিতে পারো
আমি শেষ চেষ্টা করে দেখি
দেখছ শরীরে এখনও উত্তাপ আছে
পেশীতে গাণ্ডীবের টঙ্কার
প্রতিধ্বনিময়
দেখছ দৃষ্টি এখনও উন্মুক্ত ঋজু
যৌবনের বাসন্তী আলো
তির তির করছে সেখানে।
বিশ্বকে ওর ডানহাত এগিয়ে দিয়েছিল
পাঁচটি আঙুল ভালোবাসার পঞ্চশিখা
শোষণ শাসনেও যে শিখা অকম্পিত।

হয়ত ও নিহত নয়, মূর্ছিত
আমি শেষ চেষ্টা করে দেখি
সেই আশ্চর্য শিকড়টা দিতে পারো
যার নাম সংহতি।